আখ্যানের পরিসরে ইতিহাস : মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি উপন্যাস

রাহুল দাশগুপ্ত

ভূমিকা

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে মহাশ্বেতা দেবী অন্তত বিষয়ের দিক থেকে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ করেছেন। ইতিহাসকে তিনি বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছেন আখ্যানের পরিসরে। আবার সেই পরিসরে লিখতে চেয়েছেন তলদেশ থেকে দেখা ইতিহাস। একের পর এক রচনায় খনন চালিয়ে পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আসতে চেয়েছেন উপনিবেশিতের বিকল্প ইতিহাসকে, বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে নিয়ে গেছেন বহু অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে, মিথ ও ফ্যান্টাসির যৌথ প্রয়োগে আখ্যানকৌশলে নিয়ে আসতে চেয়েছেন নানা অভিনবত্ব। সময়ের আধার হয়ে থাকে যে ইতিহাস ও সাহিত্য, তাদেরও নির্মাণ করে ক্ষমতার স্বর, ক্ষমতাহীনদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের কোনও গুরুত্বই থাকে না সেখানে। কারণ সর্বদেশেই ইতিহাসের রচনাকার সেই ক্ষমতাবান শ্রেণী, যারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থবিরোধী কোনও কিছুই সংরক্ষণের পক্ষপাতী নয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাসে আখ্যানকারেরা সেই লুপ্ত করে দেওয়া দমিত, নিষ্পেষিত, অদৃশ্য ইতিহাসকেই ফিরে পেতে চেয়েছেন। তারা নিজেদের দৃষ্টিকোণ, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা থেকে যেমন অতীতকে পুনরাবিষ্কার করতে, তেমনই বর্তমানকেও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী ঠিক এই কাজটিই করেছেন।

উত্তর-ঔপনিবেশিক ঔপন্যাসিকেরা ফর্মের দিক থেকেও বহু কাজ করেছেন। মৌখিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপকরণ মিশিয়ে ও বিভিন্ন বর্গের সংমিশ্রণে (multigenre or the quality of incorporating diverse genres) ঘটিয়ে আখ্যানের এক মৌলিক কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছেন তাঁরা। এই 'মালটিজঁর টেক্সট' লেখার ক্ষেত্রেও মহাশ্বেতা বাংলা উপনাসে অগ্রগণ্যদের একজন। তিনি তাঁর লেখায় বারবার মিশিয়ে দিয়েছেন প্রবাদ (proverbs), অতিকথা (myth-making), উপকথা, (fable), নীতিকথা (parable), অতিরঞ্জন (exaggeration), ইতিহাস (history), কিংবদন্তী (legend), রহস্য (mystery), ক্ষমতা (power), অতিলৌকিক (supernatural), নাটক (drama), গান (songs), সঙ্গীত (music), সংলাপ (dialogues) এবং অনুকৃতির (mimicry) মতো নানা মৌখিক কৃতি (Oral performance)।

বিষয়-ভিত্তিক ভাগ

মোটামুটিভাবে মহাশ্বেতার উপনাসগুলিকে বিষয়-ভাবনার দিক থেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু এই ভাগগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তাদের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্যসূত্র রয়েছে।

বিষয়-ভাবনা ১ : 'নারী'

একেবারে গোড়া থেকেই মহাশ্বেতার উপন্যাসে বিষয় হিসাবে এসেছে 'নারী'। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ঝাঁসির রানি'। এই উপন্যাসে এক ঐতিহাসিক নারীর অতুলনীয় জীবনকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন মহাশ্বেতা। মধ্যভারতে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান রূপকার ছিলেন রানি লক্ষ্মীবাঈ। এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা লিখেছেন, '১৮৫৭ সাল সম্পর্কে একখানা নতুন ইতিহাসের প্রয়োজন ভারতীয় পাঠক বিশেষভাবে অনুভব করছেন আজ। এবং যতদিন সে ইতিহাস রচিত না হবে, ততোদিন ১৮৫৭ -তে সাধারণ মানুষের ভূমিকা প্রাপ্য স্বীকৃতি পাবে না।' মহাশ্বেতা সেই বিকল্প ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন লোকগীতি ও ছড়ায়। তিনি লিখেছেন, 'কী ভয়াবহ অত্যাচার উপেক্ষা করে তারা নির্ভীকভাবে এই সংগ্রামকে যথার্থ মূল্য দিয়েছে তা বোঝা যায়, যখন দেখি লক্ষ্মীবাঈকে সাহায্য করার অপরাধে বিধ্বস্ত জনপদ ও গ্রাম থেকেই তাকে কেন্দ্র করে কত গান ও ছড়া রচিত হয়েছে।'

রাজনর্তকী মোতির সঙ্গে প্রাসাদের পাঠান ফৌজি সরদার গুলাম ঘৌসের তোপখানার হাবিলদার খুদাবক্সের অতীন্দ্রিয় প্রেম নিয়ে 'নটী' (১৯৫৭) উপন্যাসের সূত্রপাত। ক্রমে চলে আসে ঝাঁসির বিপ্লব, দুঃখ-ত্যাগের মধ্যে উভয়ের প্রেমের উত্তরণ ঘটে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে মোতি ও খুদাবক্স। রক্তে খুদাবক্সের দেহ ভেসে গেলেও নটী মোতি যুদ্ধ করে চলে এবং বীরের মৃত্যু বরণ করে। এইভাবে একজন নারীশিল্পী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় নিজের পরিবর্তিত ভূমিকাতেও সমান পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং জীবন বিপন্ন করে, প্রেমকে বিসর্জন দিয়েও সাহস অক্ষুণ্ন রাখে।

মানুষ-পশু-মৃত্যুভয় মিলেমিশে থাকা সার্কাসের জীবন নিয়ে লেখা গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'প্রেমতারা' (১৯৫৯)। পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়ে প্রেমতারাকে তার বাবা সার্কাস দিয়ে গিয়েছিল, তারপর ভয় পেতে পেতে আর নানা সার্কাস ঘুরে প্রেমতারা পৌঁছয় জুবিলি সার্কাসে। এখানে সে তারের ওপর নাচে, দড়ি দোলায়, ঝাঁপ দেয়, বাঘের মুখে মাথা গুঁজে দেয়। বাঘ-সিংহের যত্ন করার জন্য চাকরের কাজে বহাল হয়েছিল মনোহর, ক্ষিপ্ত বাঘের আক্রমণে সে পঙ্গু হয়ে যায়, পঙ্গু মনোহর খেলোয়াড় থেকে হয়ে যায় ক্লাউন, সার্কাসের যৌথ জীবনের ভেতর

প্রেমতারার সঙ্গে তার প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সার্কাসে একজন খেলোয়াড়ের খেলা শিখতেই সময় লাগে পনেরো-ষোলো বছর, তারপর খেলা দেখায় সে সাত-আট বছরের বেশি নয়, এরপর থেকেই তার অবতারণ শুরু হয়। সার্কাস দলের একদা কুইন প্রেমতারার শরীর ভেঙে যায়, খেলা পড়ে যায়, ধোবাবস্তির অন্ধকারে বাসা বাঁধে সে, মদ-জুয়ার আড্ডা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে, বস্তিসমাজের রানি হয়ে ওঠে, এমনই তার ব্যক্তিত্ব।

'বায়োস্কোপের বাক্স' (১৯৬৪) উপন্যাসটি এগিয়েছে উচ্চবিত্ত পরিবারের নিঃসঙ্গ মহিলা শেলীমাসির স্মৃতিচারণার সূত্রে। একটি দিনের পরিধিতে, পুরনো ছবি দেখার মধ্য দিয়ে শেলীমাসি আর তার চারপাশের মানুষজন, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুদের জীবন পাঠকের কাছে উঠে এসেছে। এই আখ্যানে রয়েছে এক হারানো জীবন আর জগতের জন্য স্মৃতিকাতরতা, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় স্মৃতিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা বড় দুষ্কর। উপন্যাসের শেষে তাই শেলীমাসি চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে দেন বায়োস্কোপের বাক্সটিকে, স্মৃতিকে পিছনে ফেলে ভারমুক্ত হতে চান। এই উপন্যাস এক নারীর অতীত ও বর্তমানে সহাবস্থানের ব্যক্তিগত কাহিনী, কিন্তু এক বিষণ্ণতার সৌরভে তা আচ্ছন্ন। দশ বছর পরে লেখা 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪) উপন্যাসে ব্রতী মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সমু, বিজিত, পার্থ আর লালটুকে সাবধান করার জন্যই মা সুজাতাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেরিয়ে গেছিলো। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা ব্রতীর ছিল। এই স্পর্ধাই পাল্টে দিয়ে গেল সুজাতাকে। একজনের মা থেকে তিনি হয়ে উঠলেন বহুজনের মা। কোনও ব্যক্তির প্রতি নয়, গোটা একটা সময়ের প্রতি তিনি মায়ের মতো দায়বদ্ধতা অনুভব করলেন। এইভাবে মহাশ্বেতার উপন্যাসে নারী-ভাবনা বহু স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে বিস্তৃতি পেয়েছে। যেখানেই নারীকে তিনি অস্বীকৃত হতে দেখেছেন, সেখানেই তার প্রাপ্য স্বীকৃতির জন্য কলম ধরেছেন ও অগ্নিবর্ষণ করেছেন।

বিষয় ভাবনা ২ : 'ইতিহাস'

মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'অমৃত সঞ্চয়' (১৯৬২)। এই রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র ভবানীচরণ, তারই উত্তরণ ঘটে, ব্যক্তিজীবন অতিক্রম করে সে হয়ে ওঠে গণ ও সমাজ জীবনের অংশ। মহাশ্বেতার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে এই বিষয়টিই বারবার প্রাধান্য পেয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে প্রায় শ'খানেক চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা এই কাহিনীতে জনজীবনের মধ্য দিয়ে স্বদেশকে আবিষ্কারের চেষ্টা কার হয়েছে। একদিকে রয়েছে ইংরেজ-ভারতবাসীর বহুমাত্রিক সম্পর্ক, অন্যদিকে ভারতবর্ষকে চেনা যায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ধর্ম, কুসংস্কার, নীচতা, মহত্ব দিয়ে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, সাধারণ মানুষের চরিত্র, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা - সংস্কার, যানবাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ, তুচ্ছ ও উচ্চ মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যথাসম্ভব প্রামাণ্য করে তুলতে চেয়েছেন লেখক।

'আঁধারমানিক' (১৯৬৬) উপন্যাসেও ইতিহাসকে দেখা হয়েছে তলদেশ থেকে, সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে, তাদের রোজকার যাপনচিত্রের ভেতর দিয়ে। আলিবর্দীর রাজত্বকালে ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত দশ বছর সময়কালে বর্গীরা বারবার বাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, অর্থ-সম্পদ-ফসল লুঠ করেছে। বর্গী আক্রমণকে ঠেকাতে গিয়ে নবাবের শক্তিক্ষয় ঘটে, কোষাগার শূন্য হয়ে যায়, ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, সে রন্ধ্রপথেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে প্রবেশ করে এক নতুন ইতিহাস। মারাঠা আক্রমণের ভয়াবহ অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে বাংলা থেকে দলে দলে মানুষের গৃহহারা, বাস্তুহারা, শরণার্থী হয়ে যাওয়ার অতীতকেই পুনর্নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসে, যার বিষয় হিসাবে এসেছে, 'লোকচলাচলের ইতিহাস' এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে এসেছে 'চলমান জনতার স্রোত'। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে বর্ধমান জেলার একটি কাল্পনিক ও প্রতীকী গ্রাম 'আঁধারমানিক'কে কেন্দ্র করে। কাহিনীর সূত্রপাত ১৭৪২ সালে। সেই গ্রামের সাধারণ লোকচরিত্র, লোকাচার, ধর্মীয় আচার - সংস্কার যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে সে সময়ের বাণিজ্য পদ্ধতি, এদেশি-বিদেশি বণিক, রাজনৈতিক চরিত্রেরা। বর্গী আক্রমণের ধাক্কায় আঁধারমানিক গ্রামের সীমানা বড় হতে হতে মিশে যায় বিশাল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে।

গোড়া থেকেই উপন্যাসে ব্যক্তি ও গণ-জীবন সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে, যদিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিজীবন মিশে গেছে গণ-জীবনে। গণ-জীবনের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে এসেছে সেই সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন। বাংলার রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতি, নবাব ও তাঁর সামন্ত-রাজারা, বাংলার রাজনীতিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ, ঔপনিবেশিক শক্তির সুকৌশলে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তির ক্রমবৃদ্ধি, এইসব নিয়েই এসেছে রাজনৈতিক জীবনের কথা। মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন, এ দেশের আসল টাকা জোগায় জমিদার ও কিছু ব্যবসায়ী। বাংলার অর্থনীতিতে কার দখল বেশি থাকবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে দেশি ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি। এ দেশি ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে, এইসবই দেখাতে চেয়েছেন তিনি। সামাজিক জীবনে মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন কীভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও পুরুষদের প্রতাপে কোণঠাসা হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে অন্ত্যজ মানুষেরা ও নারীরা। একের পর এক নারীর জীবন বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন কী অসহনীয়, ভয়াবহ সামাজিক পরিস্থিতির তার

শিকার, তাদের নিয়ে রমরমা করে চলেছে দাস- ব্যবসা, এমনকী সংসারেও তাদের জীবনে কোনও নিরাপত্তা নেই, যে কোনও মুহূর্তে তাদের ওপর নেমে আসছে নানা শাস্তির খাঁড়া, পুরুষশাসিত সমাজে তাদের জীবনের কানাকড়ি মূল্যও দিতে রাজি নয় কেউ। এইসব নারী জানে, 'দ্বাদশ বঙ্গাব্দে, বাংলার মেয়ের সামনে অন্ধকার গাঢ়, নিশ্ছিদ্র, সীমাহীন। মেয়েদের পান থেকে চুন খসলে ত্যাগ করবার, পতিত করবার হাজারটা বিধি আছে। যারাই আপত্তি করে, আপত্তি জানায়, তাদের গতি হয় তীর্থস্থানের বাজারে। তাদের বেশ্যা হতে হয়,।' কিন্তু এই বিপজ্জনক, অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও নারী প্রতিবাদ করে, সহ্য করে, অটল ধৈর্য্যে ও ব্যক্তিত্বে সম্মানিত হয়ে ওঠে।

একইরকমভাবে সমাজপতিদের নিগ্রহ সহ্য করতে হয় অন্ত্যজ মানুষদেরও। কিন্তু মহাশ্বেতা একচেটিয়াভাবে নিপীড়িত, নিগৃহীত হওয়ার কাহিনী লিখতে চাননি। তাই সময়ে সময়ে ফুঁসে উঠেছে ক্ষমতাহীন মানুষ। সামন্ত-রাজার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা বিদ্রোহ করেছে, অন্ত্যজ পুরুষেরা অন্তত তাদের পরিবারের নারীদের সম্মান রাখতে চেয়েছে। নিজের বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সমাজপতির মেয়েকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে নরপতি, নিজের স্ত্রী হত্যার প্রতিবাদে সমাজ ছেড়েছে, খ্রিষ্টান হয়েছে রামাই বাগদি, এইরকমভাবে প্রতিবাদী হয়েছে কাশীশ্বর, মানুষ সচেতন হয়ে শুধু নবাবের ওপর নির্ভর না করে সম্মিলিতভাবে বাংলার গ্রামে গ্রামে বর্গীদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে, আর এইভাবেই ক্ষমতীর বিরুদ্ধে সমান্তরাল ভাবে লেখা হয়েছে ক্ষমতাহীনের গৌরবময় ইতিহাস। আবার ক্ষমতার ইতিহাস যে কত গ্লানিময়, তা জানাতেও ভোলেননি মহাশ্বেতা, বিশেষ করে জগৎপতির মতো মানুষের উত্থানের কাহিনী শুনিয়ে, যে নিজের পরিবার ও দেশকে বিক্রি করে দিতে চায়, আর নিজের জীবনের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে চায় শ্বেতাঙ্গদের তোষামোদ করে। দেশীয় শক্তির সেবক অথচ বিবেকী পুরুষ মহীপতি, সন্ন্যাসী ও নিরাসক্ত সুরকণ্ঠ এবং গৃহী ও উদ্যোগী আনন্দীরাম এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র। এরা একই সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, আবার সচেতনভাবে নিজেদের সময়ের দ্রষ্টা ও বোদ্ধা। এরকমই এক উন্নত চরিত্র শিবকালী, নিজের উদ্যোগে জীবনে যে অনেক বড় হয়েছে, যাকে জগৎপতির বিপরীতে স্থাপন করতে চেয়েছেন লেখক। এদের এবং বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলিকে নিয়েই মহাশ্বেতা রচনা করতে চেয়েছেন এই উপন্যাসের পারিবারিক বিশ্ব। এরকমই এক অসামান্য নারী চরিত্র বিশালাক্ষী, যে বলে, 'দেশে যখন এই ডামাডোল, তখনও এরা সমাজ করেছেন। মানুষ যে মরে গেল, সমাজটা আছে কোথায়?'

তবে 'আঁধারমানিক' উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, উদ্বাস্তু জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিকে এই উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। উপনাসের একটি চরিত্র বলে, 'চাষিরা দেশ বলতে অন্য জিনিস বোঝে, তাদের কাছে তাদের ধানক্ষেত আর কুঁড়েঘরটাই দেশ। রাজারা বোঝেন, দেশ বলতে সেইসব জায়গায়, যেখানে হতে তাঁরা খাজনা পান। আমরা, ব্যবসায়ীরা দেশ বলতে বুঝি যেখানে ব্যবসা, সেখানে দেশ।' উপন্যাসের গোড়ায় দেখা গেছে এক বাণিজ্য সমৃদ্ধ বাংলাকে। মুর্শিদাবাদ তখন শুধু নবাবের রাজধানীই নয়, গোটা দেশের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-নগরী, পৃথিবীর এক বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয় এখানে। এখানকার অনেক ব্যবসায়ী ইউরোপের অনেক রাজা-রাজড়ার চেয়েও বেশি ধনী। এখানকার রেশমের লোভেই বিদেশী বেনেদের এখানে পড়ে থাকা। লেখক লিখেছেন, 'কে না জানে ইন্ডিয়া মানেই বাংলা? একমাত্র বাংলা সুবা থাকলেই ইস্ট ইন্ডিয়া ক্রমে ধনী হয়ে উঠছে। এই যে আফ্রিকা, আমেরিকা জুড়ে ইংলন্ড ব্যবসা করছে, আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে বেচছে আমেরিকায়, তার মূলে তো এই বাংলায় ব্যবসা করার সুবিধে।' কিন্তু এরই পাশাপাশি রয়েছে আঁধারমানিকের মতো গ্রাম, যেখানে, 'কিংবদন্তী অজস্র জন্মায়, স্নেহে যত্নে লালিত হয়, চিরদিনের মতো বেঁচে থাকে। এ গ্রামের মানুষ সন্তানস্নেহে কিংবদন্তীকে জিইয়ে রাখে।' বর্গীদের লুন্ঠনে বাংলার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের বাস্তু বিপন্ন হয়ে পড়ে, রাজা-কৃষক-ব্যবসায়ী সকলের দেশ আক্রান্ত হয়।

এর ফলে দেশে, গাঁয়ে, সমাজে, শ্রেণীতে তুমুল ভাঙচুর দেখা দেয়, বদ্ধ জলে যা তার ব্রত, পূজা, পার্বণ, সংস্কার নিয়ে ছ'শো বছরের ওপরে স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছিল, তা প্রবল নাড়া খায়। চাষি, তাঁতি, কুমোর, কামার—সবাই তাদের জাতব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হয়, শত শত মানুষ দেশান্তরি হতে থাকে, সমস্ত বাংলা বামুন-শূদ্রে, ধনী-দরিদ্রে, হিন্দু-মুসলমানে, ব্যবসায়ী-বাউলে, রাজপুত-দরবেশে, গৃহস্থ-কাঙালে, বৃদ্ধ - শিশুতে, নারী-পুরুষে একাকার হয়ে পথে নেমে পড়ে। নদীর ঘাটে হাজার হাজার মানুষ জড়াজড়ি করে পশুর মতো বসে থাকে। এরই মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে থাকে কিছু কিছু সামন্ত-রাজা। মহাশ্বেতা এর বর্ণনা দিয়েছেন, 'এ চালচিত্রে কৃষিক্ষেত্রে অরণ্য, বাংলার বস্ত্রশিল্প ছিন্নভিন্ন, বৃদ্ধ শাসক ভাগ্যের হাতে লাঞ্ছিত, আর বাংলার সাধারণ মানুষ যাদের চিরদিন কোমরে নেকড়া, হাতে লাঙল, শীর্ণ বলদ, এইমাত্র সম্পদ, রাজঋণ, শ্রেষ্ঠীঋণ, দেবঋণ শুধে যে মুঠোভরে অন্ন পায় কি পায় না, তারা আজ গৃহহারা, বিতাড়িত, পথে পথে নিরাশ্রয়।' সেই দেখে খ্রিস্টান ঐতিহাসিক লেখেন, 'এক্সোডাস। যেমন দেখা গিয়েছিল যিশুর জন্মের আগে ইস্রায়েলে। যেমন দেখা গেছে অন্যত্র, নিউ ওয়ার্লডের কলোনিতে।...সবকিছু ট্রাভেল করছে, রিলিজিয়ন, ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি।' উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, কলকাতায় সম্পূর্ণ এক নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, অমোঘ আকর্ষণে কলকাতা

তাই গোটা বাংলার ছিন্নমূল, গৃহহারাদের ডাক দিচ্ছে, হাজারে হাজারে ঘর উঠছে সেখানে কারণ সেখানে রয়েছে জীবন ও জীবিকার আশ্বাস। এমনি করেই ইতিহাসের যে ধারা পথ বদলায়, তাকেই ধরতে চেয়েছেন মহাশ্বেতা, লিখেছেন একটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে জোয়ার এসেছে, লেখা হয়েছে ‘সেই সময়’, ‘শাহজাদা দারাশুকো’, ‘মৈত্রেয় জাতকে’র মতো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বিষয় : ভাবনা ৩ : ‘বীর’

‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৭) থেকে মহাশ্বেতার উপনাস এক নতুন বাঁক নিতে শুরু করে। সত্তর দশকে এই বাঁক বদল ঘটে। কী ছিল তার কারণ? নন্দিতা বসু লিখছেন, ‘এক তরুণ স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র, যার কাছে স্বাধীনতা - পরবর্তীকালে আকাঙ্খা এবং দাবি ছিল যে সে প্রতিটি সাধারণ ভারতীয় নাগরিককে পৃথিবীর যে কোনও অন্য রাষ্ট্রের মানুষের মতো মাথা উঁচু করে হাঁটতে সাহায্য করবে। ...ক্রোধ সেই অর্থে মূলত এমন এক রাষ্ট্রের প্রতি যা এক প্রাচীন গলিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করে নতুন কিছু নির্মাণে অপারগ এবং কার্যক্ষেত্রে প্রায়শই ওই গলিত প্রাচীনকে সাহায্য দানে উৎসাহী। এবং এ সময়ের সাহিত্যসৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের বিরাট মাত্রায় উপস্থিতির কারণেই রাজনীতির কথা পাঠকের মনে হবে।’ গোটা বিশ্বেই উত্তর-ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডগুলিতে এই মোহভঙ্গের ঘটনা ঘটে, যার ছবি উঠে আসতে থাকে বিভিন্ন উপন্যাসে। ঘানার অয়ি কোয়ি আরমা, নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবে, কেনিয়ার এনগুয়ি ওয়ার থিয়োংগের মতো মহৎ লেখকেরা সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় শাসকদের যৌথ ষড়যন্ত্রে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতারিত হওয়ার ধারবাহিক ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, স্বাধীনতা নামক প্রহসনটিকে আক্রমণ করতে থাকেন। গোটা বিশ্বে যখন একটা প্রতিস্পর্ধী স্বর সম্মিলিতভাবে সরব হয়ে উঠতে থাকে, তখনও সংখ্যা - গরিষ্ঠ বাংলা ঔপন্যাসিকেরা তাকে শনাক্ত করার পরিবর্তে, যাবতীয় সঙ্কটকে এড়িয়ে সমঝোতামূলক লেখালেখিই চালিয়ে যেতে থাকেন। মহাশ্বেতা কিন্তু সেই উদাও আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন এবং সেই স্বরে নিজের স্বর মিশিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আঞ্চলিক উপন্যাস লিখেও ওই প্রতিস্পর্ধী স্বরের জন্যই তাঁর লেখা হয়ে উঠলো আন্তর্জাতিক, আর যারা অন্ধের মতো পশ্চিমের অনুকরণে লঘু ও মাপা সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাদের রচনায় শেষ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক এবং সময়-অতিক্রান্ত স্থায়ী তাৎপর্যই রইলো না।

অনেক দিন থেকেই মহাশ্বেতা পথ খুঁজছিলেন। ‘নারী’ ও ‘ইতিহাসে’র পর এবার তাঁর সন্ধানের বিষয় হলো, ‘বীর’। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘আমি সর্বদা বীর খুঁজি। বীর পূজার রোমান্টিকতা আমার মধ্যে দীর্ঘকাল ছিল। আর এই ‘বীর’ খুঁজি সাধারণ মানুষের মধ্যে। এমন কতো বীরের কথা না লিখেছি।’ ফলে সত্তর দশক থেকেই মহাশ্বেতা একের পর এক বীর নায়ক খুঁজতে লাগলেন, যারা রাষ্ট্র-প্রশাসন-সামন্ত প্রভু-নয়া ঔপনিবেশিকতার অন্যায়-আধিপত্যকে মুখ বুজে মেনে নিতে রাজি নয়। ফলে একে একে সৃষ্টি হতে থাকে বীরসা মুন্ডা, বসাই টুডু, চোট্টি মুন্ডা, মাস্টার সাব, হরিরাম মাহাতো, তিতুমীর, সিধু-কানু, সুরজ গাগরাই, মহানাম দত্ত, ভীমের মতো ঐতিহাসিক, কাল্পনিক এবং মিথিক্যাল বীরেরা, যারা কোনও-না-কোনও গণ-আন্দোলন ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে, প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে চেয়েছে রাষ্ট্রীয় বয়ান ও ইতিহাসের। নির্লোভি, অসসাহসী, সৎ, উদ্যোগী ও মানবিক এইসব বীরেদের কাহিনী ইতিহাস যতোই চেপে দিতে চাক, মহাশ্বেতা চেয়েছেন সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকেই খুঁজে বার করে, এইসব বীরদের, ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ মানুষের, মহাপুরুষোচিত কার্যকলাপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার বিপুল আয়োজনের বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে সত্যকে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। মনে রাখা প্রয়োজন, দু’দশক আগে লেখা ‘ঝাঁসির রানি’তেও এক মহীয়সী নারীর মধ্যে তিন এই বীরত্বের সন্ধান করেছিলেন।

কারাগারে অমানুষিক উৎপীড়নের ফলে বীরসার মৃত্যু অর্থাৎ এক মিথের মৃত্যুতে লেখিকা ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি শুরু করেছেন এবং তারপর ফিরে গিয়েছেন অতীতে, বীরসার বাল্যকালে। গোষ্ঠীবদ্ধ জাতির রহস্যময় মনস্তত্বের ফলে বীরসা সমগ্র মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলে ভগবানপ্রেরিত দূত বলে স্বীকৃতি লাভ করে। তীর-ধনুক সম্বল করে তারা বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করে এবং বীরসার কাছে দীক্ষা নিয়ে হয়ে ওঠে ‘বীরসাইত’। বীরসা শুদ্ধচরিত্র, জিতেন্দ্রিয়, আত্মত্যাগী, আত্মসমাহিত, বিজ্ঞানমনস্ক, ব্যক্তিত্ববান এক আদর্শ পুরুষ। সে চেয়েছিল মুন্ডাদের অত্যাচারের ফাঁস থেকে মুক্ত করতে, স্বাধীন এক মুণ্ডা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ১৮৯৫-১৯০০ পর্বে এই বিদ্রোহ বা উলগুলান চূড়ান্ত সংহত রূপ নেয়। ১৮৯৯-এর ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় বীরসার উলগুলান, আর শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে এর সমাপ্তি ঘটে ১৯০১ -এর অক্টোবরে। শেষ পর্যন্ত বীরসা ধরা পড়ে এবং জেলখানায় পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়। এই একটি মিথ গড়ে ওঠা ও ভেঙে যাওয়ার কাহিনী যে প্রথমাবধি সংলাপ চালিয়ে যায় অরণ্যের সঙ্গে এবং এই সংলাপের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করে এক নতুন চৈতন্যের, বিদ্রোহের জগতে।

‘অপারেশন? বসাই টুডু’ ও ‘অক্লান্ত কৌরব’ (১৯৭৭-১৯৮২), মহাশ্বেতার সেই যুগল উপন্যাস যার

প্রেক্ষাপট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, নকশাল আন্দোলন। কিন্তু আখ্যানে নায়ক বসাই টুডু ক্রমেই যেন সেই সমকালীন ইতিহাসকে অতিক্রম করে এক অতিকথার নায়ক বা পুরাণ-প্রতিমা হয়ে ওঠে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ -এর মধ্যে বসাই টুডু চারবার মারা যায়, আর চারবারই যাকে শনাক্ত করতে ডাকা হয়েছিলো, সে কালী সাঁতরা। বসাইয়ের খোঁজে কালীর যাওয়া যেন সৎ অথচ প্রত্যয়ী এক রাজনৈতিক কর্মীর শিকড়ে, স্বপ্নের খোঁজে যাওয়া, যে স্বপ্ন মৃত্যুর পরও বারবার পুনর্জন্ম লাভ করে। ফলে বারবার পুনর্জন্ম পেয়ে বসাইও আর ব্যক্তি বসাই থাকে না, হয়ে ওঠে মৃত্যুকে পরাস্ত করার অবিনশ্বর কৃষক-সংগ্রামের প্রতীক, এক 'মিথ'। এভাবেই এক অগ্নিগর্ভ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের ভিতরে জন্ম হয় একটি মিথের। ১৯৮৭ সালে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অপারেশন? বসাই টুডু'র মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেন, 'উপন্যাসের নায়ক বসাই টুডু সত্তরের দশকের জীবনভাষ্যকে একটা মিথ-এ রূপান্তরিত করেছিল। সে মিথের গোড়ার কথা যা, শেষ কথাও তাই, সে মরেও মরে না।...মহাশ্বেতা বসাই টুডুকে প্রায় একটি অতিকথার নায়কে রূপান্তরিত করেছেন। সেখানে বারবার বসাই টুডুর বেঁচে ওঠার মধ্যে যে সংগ্রামী উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে তার মধ্যে এক অতিকথার নায়কের মৃত্যুঞ্জয় সংকল্পের আদল খুঁজে পাওয়া যায়।'

সরল কথকতার ভঙ্গিতে লেখা 'মাস্টারসাব' (১৯৭৯) আখ্যানের বিষয় জাতে কোয়েরি জগদীশ মাহাতোর নগণ্য এক স্কুল মাস্টার থেকে হরিজনদের অবিসংবাদী নেতা, দেওয়া বা কিংবদন্তী হয়ে ওঠা। ব্যালাডের মতো ঘটনার সজ্জায় যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একোয়ারি গ্রামের নিরন্ন অতি ক্ষুদ্র চাষীর সন্তান যে জগদীশ বোঝে হরিজন হয়ে জীবন কাটানো একটা অভিসম্পাত, তাদের লেখাপড়া শিখতে দেওয়া হয় না, বিশেষ করে হরিজন রমণীদের জীবনে অবেশ দুঃখ, এমনকি তাদের স্বামীরাও তাদের রক্ষা করতে অপারগ, অতএব মানুষের মনে সাহস জোগাতে হবে, সবাই রুখে দাঁড়ালে বন্ধ হবেই অত্যাচার, কারণ, 'ভয় জমতে লাগে কয়েক জন্ম/ ভয় খোয়াতে লাগে কয়েক দিন'। জগদীশ চাকরি ছেড়ে দেয়, এলাকার লোকদের সংগঠিত করে, সবাইকে বোঝায়, খেতমজুর বা গরীব কিষাণ বলেই হরিজন বা অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষেরা এত নির্যাতিত, হরিজন অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে বন্দুক হাতে তুলে নেয়, একোয়ারিকে অভিহিত করা হয় 'ভোজপুরের নকশালবাড়ি'। কোনও দল না থাকা সত্ত্বেও জগদীশের মানবিক অভিযান নকশালী বলে অভিহিত হয়। উপন্যাসের শেষে মানুষের ওপর ভরসা করেই আহত মাস্টার সাব একটি গ্রামে থেকে যায়, কিন্তু জমি-মালিকের লোকজনেরা তাকে ডাকু বলে জেনে - বুঝে চিহ্নিত করলে মানুষ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এভাবে 'মানবতার জন্য বলিপ্রদত্ত প্রেমিক' হয়ে যান মাস্টার সাব, কিন্তু মানুষ নিজেদের ভুল বোঝে এবং লোকগানের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থেকে যান তিনি।

ভারতীয় বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে মহাশ্বেতা দেবী একের পর এক প্যারাবল রচনা করেছেন, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তির' (১৯৮০)। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই বাংলা উপন্যাসের নায়ক চোট্টি মুন্ডা। সেই চোট্টি মুন্ডাকে ঘিরে একের পর এক কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। অথচ চোট্টি মুন্ডা বীরসার মতো কোনও 'উলগুলানে'র নায়ক নয়। নিজের কাছে সৎ থাকার জন্য অন্যান্য বহু মুন্ডার মতো সে কখনও কোনও মরিয়া কাজ করেনি, হত্যা করেনি, ধর্মান্তরিত হয়নি, কোনও বৃহত্তর স্বার্থে প্রাণ বিসর্জন দেয়নি। অথচ মুন্ডা-জীবনের যা কিছু ভালো, তার সব কৃতিত্বই বর্তায় তার ওপর। তার নামে দিকুদের মনে ত্রাস জাগে, যার কারণ বুঝতে না পেরে চোট্টি নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। কৃষ্ণের সুর্দর্শন চক্রের মতোই চোট্টি মুন্ডার তীর নিজেই হয়ে ওঠে কিংবদন্তী, যে সর্বদাই লক্ষ্যভেদে সক্ষম এ মুণ্ডাদের কাছে ন্যায়ের প্রতীক, আত্মরক্ষার অমোঘ ও চূড়ান্ত অস্ত্র। উপন্যাসের শেষেও যে তীর আটাত্তর বছরের চোট্টি বহুকাল ব্যবহার করেনি, সেই তীর নিয়ে এগিয়ে অসে মুন্ডা সমাজকে রক্ষা করতে। যে হত্যা সে করেনি, নিজেকে তার হত্যাকারী প্রতিপন্ন করতে অব্যর্থ লক্ষভেদ করে দেখায় এবং নিজেকে বলিপ্রদত্ত করে মুন্ডা সমাজকে রক্ষা করে। কিন্তু চোট্টিকে কেউ ধরতে পারে না, নিরস্ত্র হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওভাবেই থাকতে থাকতে চিরকালের জন্য মিলেমিশে হয়ে যায় নদী, কিংবদন্তী, অবিনশ্বর। চৈতন্যর মতো রহস্যাবৃত থেকে যায় তার সমাপ্তিপর্ব, খ্রিস্টের মতো তার আত্মোৎসর্গ শুধু কিংবদন্তী হয়ে যায়, স্পার্টাকাসের মতো তাকেও বাঁচাতে উঠে আসে হাজার হাজার মুন্ডার হাত, স্বাধীন ভূখণ্ডের উপনিবেশকারী দিকুদের প্রতিস্পর্ধী বয়ান হয়ে থাকে কিংবদন্তীতে ঘেরা তার জীবন।

'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২) আরেক জন সন্তের কাহিনী। এই আদিবাসী শিশুটিকে বাঁচানোর জন্যই অভুক্ত মা মিশনে দরজায় ফেলে রেখে যায়। হরিরাম এক শিক্ষিত, উদ্যোগী পুরুষ হয়ে উঠলে মিশন তাকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু হরিরাম মানুষের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, সে বারবার দাঁড়িয়ে যায় গরিব মানুষের স্বার্থ ও মিশনের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। মিশনের এক পরিচয়হীন কর্মী হওয়ার বদলে হরিরাম চায় মানুষের ভেতর এক স্থায়ী পরিচয় নিয়ে বাঁচতে। ফলে কখনও সে হয়ে যায় আদিবাসী, কখনও রবিদাস, এভাবেই শ্রেণিচ্যুত এক মানবিক পরিচয়ে থিতু হয়ে যায় সে। হরিরাম শেষপর্যন্ত মিশনের স্বরূপ বুঝতে পারে, মিশন ছেড়ে যেতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু মিশন এই মানুষটির বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে বুঝতে পেরে, তার নামে মিথ্যা রচনা করে। ফলে যে মানুষের হয়ে হরিরাম লড়তে চেয়েছিল, তারাই তাকে হত্যা করে, খ্রিস্টের মতোই যেন সে ক্রুশবিদ্ধ হয়।

১৯৮২-৮৩ সালে খড়কাই বাঁধ নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ওই বাঁধ তৈরি করার জন্য আদিবাসীদের জমি ব্যাপকভাবে অধিগ্রহণ শুরু হয়। চাইবাসার কাছাকাছি ইলিয়াগড় নিবাসী গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়া রুখে দাঁড়ান। এই ঘটনাকে প্রেক্ষাপট করেই রচিত হয় 'সবুজ গাগরাই' (১৯৮৩) উপন্যাস। তিনটি নদী মিলেমিশে গড়ে উঠেছে চেরো নদী, কাহিনীর নায়ক সুরজ ছোটো থেকেই শুনে আসছে এই চেরোর বুকে বাঁধ হবে। সিংভুম বা কোলহান– কোলদের দেশ। সেখানে জঙ্গল আছে, খনি আছে, শস্যক্ষেত্র আছে, কিন্তু স্বভূমে পরবাসী হয়ে আছে কোলেরা, তাদের জন্মভূমি চলে গেছে টাটা, বিড়লাদের মতো দেশি শিল্পপতিদের হাতে, জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে চলেছে ঠিকাদাররা। সুরজ ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিল। সুরজ অনুভব করে, এই কোলহান শুধুমাত্র কোলদের। কোলবিদ্রোহ অংশ নিয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষরা, নিঃস্ব জননীকে তাদেরই রক্ষা করতে হবে। সুরজ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল দেশের সেবা করবে বলে, কিন্তু সেখানে গিয়ে তার চোখ খুলে যায়। সে রাষ্ট্রের স্বরূপ বুঝতে পারে। সে দেখে কী ভাবে খনিগুলিতে শিশুশ্রমিকদের কাজে পাঠানো হয় আর দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু হলে রাষ্ট্র-প্রশাসন আসল দোষীদের চেপে দেয়। সে দেখে কী ভাবে রাষ্ট্র ডাকাত বলে প্রতিপন্ন করতে চায় মানুষের অধিকারের জন্য যুদ্ধরত বীর নায়ককে। চেরো নদীর ওপর বাঁধ তৈরি আটকাতে সে গড়ে তোলে চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি। অনেককাল পরে প্রাচীন বিদ্রোহের নেতাদের নামগুলি আবার ফিরে আসতে থাকে কোলহানে। ১৮৩১-৩২ সালের কোল বিদ্রোহের নায়ক সুরগাই যেন ফিরে আসে সুরজ হয়ে। দেশকে ভালোবেসে গরিব মানুষের হকের লড়াই লড়তে গিয়ে সুরজ হয়ে যায় দেশদ্রোহী। কিন্তু তাকে শনাক্ত করে এমন কোনও লোককে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত সুরজের মৃত্যু হয় বটে কিন্তু মৃত্যুর পর সে আরও বেশি প্রশাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। গাছের গায়ে, পাথরের গায়ে ক্রমাগত লেখা হতে থাকে তার নাম এবং সে নাম মুছেও শেষ করা যায় না।

'বিবেক বিদায় পালা' (১৯৮৩) উপন্যাসের নায়ক বিবেক বা বটুর জন্ম হয় চৈতন্যের জন্মলগ্নে, একই সঙ্গে, সুলতানি বাংলায়। সে বামন। জন্মের সময় মা দেখবার আগে সে চাঁদ দেখে। কিন্তু বড় হয়ে আবিষ্কার করে, তার উচ্চতায় আকাশ দেখা যায় না, মাটি চোখে পড়ে। হুসেনশাহী বাংলার সমাজের শোষিত, নগ্ন, ভয়াল রূপ তার অভিজ্ঞতাতেই উদঘাটিত হয়। এই রচনা পরিপূর্ণ হয়ে আছে নানা লোকছড়া, ব্রত-সংস্কার ও কিংবদন্তীতে। চৈতন্যকে এ উপন্যাসে একবারই দেখা যায় কিন্তু বটুর যাত্রা হয় চৈতন্যের ঠিক বিপরীতে। চৈতন্য যতো মহামানব হয়ে উঠতে থাকে, বটু ততো মনুষ্যত্ব হারাতে থাকে। চোখের সামনে সে দেখে তার মা'র প্রতি বাবার নৃশংস আচরণ, দুই দিদির বিয়ের মর্মান্তিক পরিণাম, এক দিদিকে হত্যা করে তার স্বামীর রক্ষিতা, অপর দিদিকে তার বাবা নিজে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসে, পরে ধর্ষিতা হয়ে তার মৃত্যু হয়। সে দেখে, তার দাদা যে নারীকে ভালোবাসতো, কীভাবে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। মিথ্যা আশ্বাস পেয়ে দরিদ্র দাদা বাধ্য হয় এক ধনী অথচ কুরুপা মেয়েকে বিয়ে করতে। আশ্বাস সত্য না হলেও সেই কুরূপা মেয়ের মধ্যে দেখা যায় পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠার আভাস। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে নারী-জীবনের ভয়াবহ বাস্তবতা দেখে সে গৃহত্যাগ করে এবং হয়ে ওঠে এক ভণ্ড সন্ন্যাসী, বহু মানুষের চোখে সে দেবতা বনে যায়। বলে ওঠে, 'যাবো পাপ করতে! ভালো হবো কেনী? সকল তো পচে গিছে রে, সকলি শ্মশান হয়ে গিছে।... আমি কে রে দুখে? পোকের পোক, পতঙের পতঙ! মোর মাঝে ভালই লাই কিছু, তাই আমি দেবতা হঞাছি। বড় পাপে ভর্যে যেঞেছে সভ, ই শুনে শুনে কানে পোক পড়্যে, তাই দেখতে বেরিয়্যে আলাঙ! কুকুর তাড়া হঞে বেরোয়েছি দুখে, বড় দুস্কে। ভাল হয়ে মানুষ মরে, তাই আমি মন্দ হয়্যেছি।' এই মন্দ জীবনে বটুর সঙ্গী হয় এক অন্ত্যজ রমণী। মহাশ্বেতা দেখাতে চেয়েছেন, বটুর এই মন্দ হয়ে যাওয়াও আসলে এক বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ করে, কারণ, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে, 'বামুনের বামনাই ঘুচাব।...মেয়ে বিচে, সন্তানের লোউ শুষে যি বামুন বামনাই কর্যে, তারে লীলা দেখাব।... অনেক পাপ, অনেক অত্যাচার, দেবতা হব না আমি। মানুষ হয়ে দেখে নেব সব'। এভাবেই বামুন হয়েও উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বটু, নিজের বিবেককে বিদায় দিয়ে সে হয়ে ওঠে বিবেকবান চৈতন্যের মতোই এক মানব-প্রেমিক।

এক অবিনশ্বর কৃষক-নেতার নিপুণ জীবনালেখ্য 'তিতুমীর' (১৯৮৪)। হায়দর গ্রামে রোকেয়ার ছেলে তিতু শান্ত, লক্ষ্মী হয়ে, চাষবাস করে জীবন কাটানোর বদলে তাজুদ্দীনের কাছে লাঠি আখড়ায় ভিড়ল, লাঠি খেলা - তির ছোঁড়া শিখল। তিতু জন্মানোর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়ে গেছে, পোকামাকড়ের মতো মানুষ মরেছে, কুড়ি বছরের তিতুর পাহাড়ের মতো শরীর, উজ্জ্বল চোখ, শাদির পর তার তিনটি ছেলে হয় একে একে। কলকাতায় এসে তিতুর মনে হয়, 'কলকাতার লোকেরা চাষ করে না, ধান কাটে না, ডিঙি বায় না, বর্ষার জল বাড়লে বাঁধের ধস আটকাতে ছুটে যায় না, তারা কোনও রকম দেহের পরিশ্রমই করে না, তবু এত এত খায়!' এই তিতুই গড়ে তোলে বিশাল বাহিনী আর বলে, 'কোনো ধর্মকে আমরা বিদ্বেষ করি না। তাহলে ধনী মুসলমানরা আজ আমাদের চোখে 'শত্রু' হতো না। আমাদের ধর্ম স্বাধীনতার ধর্ম।' তিতুর আক্রমণে নীলকররা পালাতে থাকে কুঠি ফেলে রেখে, জমিদার - তালুকদার-ধনী মুসলমান-মহাজন, সব পালায়। নীলকরদের বিস্তীর্ণ বেনাম জমিদারির খাজনা পড়ে থাকে, প্রজারা খেতে নীলচাষ বন্ধ করে দেয়। জমিদার-মহাজন-কুঠেল সাহেব, এদের গায়ে চোট

লাগলে কোম্পানি সাহেব চুপ করে থাকতে পারে না, তিতুর বাঁশের কেল্লাকে আক্রমণ করে। তিতুর মৃত্যু হয়, কিন্তু ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে, এটা শেষ না শুরু ব্রিটিশরা বুঝতে পারে না। এরপরই মহাশ্বেতা লেখেন সিধু-কানুর জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস 'হুলমাহা' (১৯৮৫)।

'স্বেচ্ছাসৈনিক' (১৯৮৫) উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের প্রচলিত 'ইতিহাসে'র বয়ানের মুখোমুখি লেখক প্রশ্নচিহ্ন হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কাকদ্বীপ-তেভাগার কৃষক-আন্দোলনের 'স্বেচ্ছাসৈনিক' এক বিরাট মানুষকে। রাষ্ট্র চায় লড়াইয়ের ইতিহাসকে মুছে দিতে, যে লড়াই স্থিতাবস্থাকে প্রশ্ন করে, তাকে উৎখাত করতে চায়। রাষ্ট্র যে স্বরচিত ইতিহাসকে চাপিয়ে দিতে চায় তাকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছে সাংবাদিক অরণি, সেই ইতিহাসের ফাঁকফোঁকর দিয়ে পৌঁছতে চেয়েছে অন্তরালে থাকা সেইসব মানুষের কাছে, যাদের স্মৃতিতেই রয়ে গেছে আসল ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত মহানাম দত্তকে খুঁজতে খুঁজতে সে পৌঁছে যায় বিপিন গিরির কাছে; রাষ্ট্রের চোখে চৌত্রিশ বছর আগে মৃত সাদা চুল, বলিষ্ঠ দেহ স্বেচ্ছাসৈনিকটি তার চোখে একাকার হয়ে যায় সেই বিশাল সালগাছের সঙ্গে, যাকে বহুবর কাটাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে ঠিকাদার কোম্পানি।

'বন্দোবস্তী' (১৯৬৭) উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের গঠনেই অন্তর্নিহিত রয়েছে বন্দোবস্তী, পারস্পরিক আপোশমূলক ব্যবস্থা। সোমের মা আর স্ত্রী এই বন্দোবস্তীর প্যাটার্নে বিশ্বাসী, যদিও বাবা ছিলেন অন্যরকম মানুষ, মতাদর্শের জন্য তিনি আজীবন পার্টির স্বার্থে আত্মত্যাগ করেছেন। সোমের সঙ্গে পরিচয় হয় রামলাল খাটুয়ার, কাকদীপ-তেভাগার মহান কৃষিসংগ্রামে যার গান নিজস্ব সুরে গ্রামীণ বাউলেরা গেয়েছে। সোমকে সে সহজেই বলে, 'তেভাগা তো কোথাও হলো না, তা এখানে তেভাগা হয়েছে।' রামলালের জমি যারা চষে, তারা নেয় দু'ভাগ, রামলাল পায় একভাগ। জীবনটা যে সব জায়গায় বন্দোবস্তী হয়ে যায়নি এই অভিজ্ঞতায় সোম বেঁচে থাকার নতুন তাৎপর্য অনুভব করে। যদিও সমাজের বন্দোবস্তীর প্যাটার্ন ছড়ানো হচ্ছে, কিন্তু এই ব্যবস্থার বাইরেই এখনও রয়ে গেছেন অধিকাংশ মানুষ, একথাই বলতে চেয়েছেন লেখক এবং একথাই বলতে চেয়েছেন লেখক এবং বন্দোবস্তীর প্রতিস্পর্ধী হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন লোকসংস্কৃতি ও লোকগানকে, রামলাল বা সোমের মতো মানুষদের।

'কৈবর্ত খণ্ড' (১৯৯৪)-র বিষয় হিসাবে এসেছে আনুমানিক ১০৭২-১১২৬ খ্রিস্টাব্দে রামপালের সময়ে ঘটা কৈবর্ত বিদ্রোহ, যে বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। যে কৈবর্তরা বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিলেন, তারা চাষী ও মৎস্যজীবী, এরা পরাজিত না হলে বাংলার মাটি থেকে জাত দেশ সংস্কৃতি - জীবনযাপন কালে কালে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারতো, ডমরনগরকে কেন্দ্র করে ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। কৈবর্তরাজ ভীমকে দমন করতে সেদিন রামপালের সঙ্গে অন্যান্য সামন্তরাজারা যোগ দিয়েছিলেন নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে। উপন্যাসের শুরু থেকেই রয়েছে ভীমের মৃত্যুর পর ডমরনগরের যুদ্ধবিধ্বস্ত মর্মস্পর্শী ছবি। যারা লাঙল চষে, নৌকা চালায়, মাছ ধরে— সেইসব পুলিন্দ, নিষাদ, শবর, ডোমদের নিয়ে অপ্রতিরোধ্য সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন দিব্যোকপুত্র ভীম। তাদের সাহস, মুল্যবোধ, বীরত্বের কথা রয়েছে এই আখ্যানে। ভীম হয়ে উঠেছে স্পার্টাকাসের মতোই এক কিংবদন্তী। তাঁর স্মৃতিতে অজ্ঞাত প্রজাপুঞ্জ দিকে দিকে শতসহস্র বটের চারা মাটিতে বসিয়ে দিয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে, এইভাবে মানষের মৃত্যু হলেও বিদ্রোহের মৃত্যু হয় না।

বিষয়-ভাবনা ৪ : 'ভুল প্রতিনিধিত্ব'

মহাশ্বেতা শুধু দেশের বীর যোদ্ধাদের কথাই লেখেননি, দেশের হয়ে যারা ভুল প্রতিনিধিত্ব করছে, দেশের ক্ষতি করছে, তাদেরও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এবং এ ব্যাপারে তাঁর মূল অস্ত্র হয়ে উঠেছে শ্লেষ ও কৌতুক। কখনও বা সেই ভুল প্রতিনিধি বিহারের নৃশংস জোতদার-জমিমালিক গণেশ সিং বা হনুমান মিশ্র, কখনও বা সৎ অথচ পলাতক, ভীরু বামপন্থী নেতা, কখনও বা ভারতবর্ষকে না চেনা মূল স্রোতের সাংবাদিক, যারা বিভিন্নভাবে দেশের ভুল বা মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব করছে। 'শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা' (১৯৮১) উপন্যাসের বিষয় বাড়া-নওয়াগড়ের জমিদারের দেহরক্ষী ও প্রচুর কৃষিজমির মালিক মেদিনীনারায়ম সিংহের পুত্র গণেশের জন্ম ও তৎপরবর্তী কাহিনী। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্রকেও হার মানতে পারে মেদিনী। গণেশকে মানুষ করার অজুহাতে অন্ত্যজ রমণী লছিমা বন্দী হয়ে থাকে মেদিনী সিংয়ের মহলে। মোহরকে বিয়ে করে নিজের সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। গঞ্জু, দুসাদ, ভাঙিগদের মানুষ বলেই মনে করে না রাজপুত মেদেনী সিং বা তার পুত্র গণেশ সিং। মৃত্যুর পরই গণেশ স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। গণেশের শ্লেষাত্মক মহিমার মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। তিনি লিখেছেন, 'স্বাধীনতার পর রাজারা সব বড়ো জোতদার। যাতে মালিকের সুবিধে তাই আইন।' আর এই জমিমালিকেরা সব 'অশিক্ষিত, পশু।' খেতমজুরদের জীবন এইসব মালিকদের হাতে, মালিকের জমিতে কাজ, বছর বছর ঋণ, সব খোয়াবার পর অন্যত্র যাওয়ার স্বাধীনতাও কারও থাকে না। এই জমিমালিকদের প্রধান ভরসা স্বাধীনতাত্তোর, উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুলিশ, প্রশাসন, আইন; কারণ ভোটের সময় এরাই টাকা দিয়ে, অধীনস্থ প্রজাদের নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করে, সরকারকে টিকিয়ে রাখে। লছমি ও হরোয়ার জীবন নষ্ট করে দেয় গণেশ, কুমারী ও গর্ভবতী রুকমিনি আত্মহত্যা করে। কৃষিকাজে

অভ্যস্ত দুসাদরা ধীরে ধীরে বনবাসী হয়ে যেতে থাকে, ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা তাদের কুরে কুরে খায়। ভেতরে ভেতরে গণেশ ক্রমশই নিঃসঙ্গ হতে শুরু করে, রাজপুত স্বজাতিরাও তাকে এড়িয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত গণেশের অত্যাচারে হরিজনদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়, গণেশ অবতারের দেবাংশী হয়ে বা দেবতার অংশে জন্ম হয়েও তাদের হাতে তার জানোয়ারবৎ মৃত্যু হয়, লছমি তার অপমানিত মাতৃত্ব ও অন্যায় বৈধব্যের প্রতিশোধ নেয় অবশেষে। যে প্রতিবাদের সূচনা করেছিল দুই অন্ত্যজ রক্ষিতা মোরি ও গঙ্গা, মালিকদের জন্য জীবন, যৌবন সর্বস্ব দেওয়ার পর মালিকদের আশ্রিতা হয়ে থাকতে চায়নি, ভিক্ষে করবে বলে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদই যেন লছমির মধ্যে দিয়ে সহিংস প্রতিবাদে পরিবর্তিত হয়।

পালামৌয়ের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছবি উঠে এসেছে ‘ক্ষুধা’ (১৯৯২)-য়, যেখানে অরণ্যের মানুষের অরণ্যের ফুল-ফলে অধিকার নেই, বনের কাঠ লরি লরি বোঝাই হয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ঠিকাদারদের কাছে, সবুজের এই ধ্বংসে বনরক্ষকরাই রয়েছে সাহায্যকারীর ভূমিকায়। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকার পাশাপাশি এই আখ্যানে এসেছে নানা সংস্কার-কুসংস্কার, বাঘের মুখে অন্ত্যজ কামিয়াদের ফেলে দেওয়ার মতো ভূস্বামীর অত্যাচার, শিকার খেলা, তেতরি ভুঁইনের নারী মুক্তি দল। ভারত স্বাধীন হলেও পরমজিৎ সিং কৌয়ার পালামৌ-র লারাতুর এস্টেটে কোনও সরকারি নিয়ম চলে না, এখানকার গ্রামগুলি কৌয়ারের ক্রীতদাসদের গ্রাম, বন্ডেড লেবার প্রথা স্বাধীনতার পরেও একইরকম থেকে যায়। এখান কুমারী ভুঁইন ও তার বাচ্চার বাঘের পেটে যাওয়ার ঘটনায় গোটা দেশের আলোড়ন শুরু হয়। এ উপন্যাসে লেখক নিম্নবর্গের আদিবাসী মানুষের অধিকারের নানা প্রসঙ্গ যেমন এনেছেন, কীভাবে দাসপ্রথা আজও স্বাধীন ভারতে বর্তমান তাও দেখিয়েছেন।

‘জগমোহনের মৃত্যু’ (১৯৭৮) সেই শ্লেষাত্মক রূপক-উপন্যাস, যেখানে নিঃসহায় গৃহপালিত হাতি জগমোহন ও তার মাহুত বুলাকি আদিবাসী গ্রাম থেকে গ্রামে ঘোরে একটু জল-নুন, খানিক বাঁশপাতা, বটপাতার জন্য। গ্রাম তাদের আশ্রয় দেয় না, বনাঞ্চল তাকে ছায়া দেয় না। ওঁরাও-মুন্ডা-দুসাদ প্রভৃতি আদিবাসীরা জমিদার-জোতদারের শোষণে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, অভাবের তাড়নায় তারা গাছের পাতাও হাতিকে দিতে পারে না, জলও না। হাতিটির জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়েই তিনি তুলে ধরেছেন ১৯৬০-৮০ সময়কালের রাজনৈতিক আবহাওয়া বা সমাজ বদলের চিত্র। চলতে চলতে অনাহারে জলাভাবে জগমোহন মারা যায়, দুর্ভাগ্যবশত এই মৃত্যু হয় সোমরার জমিতে। ধর্মের নামে দরিদ্র সোমরার জমি নিয়ে নেয় হনুমান মিশ্র, সরকারের মদতে সেখানে মন্দির হয়। সকলের সমর্থনে সোমরা সর্বহারা হয়, আরেক সর্বহারা বুলাকির সঙ্গে সব ছেড়ে তারা পথে বেরিয়ে পড়ে। রেলওয়ে স্টেশনে তারা গলা জড়াজড়ি করে রাত কাটায় আর ক্বচিৎ পয়সা পেলে ‘হাতি মেরে সাথী’ সিনেমা দেখে। অতিকায়, বলশালী, সর্বহারা হাতির রূপকে লেখিকা দেখাতে চান সেই বিশাল ভারতবর্ষকে যার চাপে মারা পড়ছে গরীব মানুষেরা আর যার মৃতদেহের ওপর গড়ে উঠছে ক্ষমতাবানের মন্দির।

নিজের কাছ থেকে ক্রমাগত পালাতে থাকে এক বামপন্থী নেতা মণিময়বাবুর কাহিনী ‘পলাতক’ (১৯৮৩) অসহযোগ আন্দোলন থেকে কষিনিকের সন্ত্রাসবাদ, তারপর জেলে বসে বামপন্থী হওয়া, বেরিয়ে এসে কৃষক ফ্রন্ট, তেভাগায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, আবার জেল খাটা, বাহাত্তর সালের নাগরিক কমিটির গঠন, এইসবই একসময় হয়ে ওঠেন ‘জঞ্জাল’, পরিত্যক্ত। দেখতে পান, সৎ ছেলেদের, কর্মীদের বিশ্বাস করা হচ্ছে না, তাদের খুঁচিয়ে ‘বিক্ষুব্ধ’ বলা হচ্ছে আর তরতর করে উঠে যাচ্ছে বিভাসের মতো অসৎ ছেলেরা। জীবনে এক পয়সা ঠকিয়ে নেননি, রাজনীতি থেকে ফায়দা ওঠাননি মণিময়, আর সেখানেই শেষ হয়ে গেছে তার রাজনৈতিক জীবন। তিনি অনুভব করেন, আমরা একদিকে তরুণদের এক নষ্ট প্রজন্ম তৈরি করছি এবং অন্য দিকে যারা সৎ ও বিবেকী, তাদের সন্দেহ করে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। একদিন দেশ ও মানুষের অবস্থা দেখে সংগ্রাম করতে নেমেছিলেন মণিময়। এখন দেশ ও মানুষ অনেক বেশি অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু তিনি এখন নিজেও সংগ্রাম করেন না এবং অন্য তরুণরা সংগ্রাম করছে দেখলে ভীষণ ভয় পান। তিনি হয়ে গেছেন পলাতক, অপদার্থ, ভীরু, আপোষপন্থী, একদা সংগ্রামের ভিত্তিতে নাম ভাঙিয়ে চলা ‘জঞ্জাল’।

‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ (১৯৯০), মহাশ্বেতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাবল, লেখিকার মতো যা তাঁর ‘সারাজীবনের আদিবাসী অভিজ্ঞতার সারাংশ।’ ‘আঁধারমানিকে’র মতো এরও কেন্দ্রে রয়েছে একটি কাল্পনিক ভূখণ্ড, ‘পিরথা জনপদ’, যাকে দুর্ভিক্ষ - এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়, পালকাপ্য মুনির কাহিনীর মতো এই রচনাতেও একটা পৌরাণিক কাঠামো ব্যবহার করেছেন লেখিকা এখানে টেরোড্যাকটিলের বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। টেরোড্যাকটিল একইসঙ্গে একইসঙ্গে মিথ ও মেসেজ, যার বাস্তবতার সঙ্গে মূলস্রোতের মানুষের কোনও যোগাযোগের সেতু তৈরি হতে পারে না। তেমনই আদিবাসী সমাজকেও মূলস্রোতের মানুষেরা হাজার বছর ধরে ভালোবাসতে পারেনি, সম্মান দেয়নি, ওদের জীবন-যাপন সমান্তরালই থেকে গেছে, কোনও আদানপ্রদান ঘটেনি। পূরণ সহায় সাংবাদিক ও মূল স্রোতের মানুষ, কেন্দ্র ও প্রান্তের এই বৈষম্যমূলক বাস্তবতা, নয়া-উপনিবেশের ভেতর আবহমান উপনিবেশের ভয়াবহতা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। সে উপলব্ধি করে, একমাত্র ভালোবাসাা, প্রচণ্ড, নিদারূণ, বিস্ফোরক ভালোবাসাই তাদের পারে টেরোড্যাকিটেল কাছে অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের

কাছে পৌঁছে দিতে।

বিষয় - ভাবনা ৫: 'শিল্পী'

মহাশ্বেদা দেবী লিখেছেন, 'বালা সাহিত্যে দীর্ঘকাল বিবেকহীন বাস্তব-বিমুখতার সাধনা চলেছে। লেখকেরা দেওয়ালের লেখা দেখেও দেখছেন না। ফলে, সৎ পাঠকের মনে তাঁদেরও বিসর্জন ঘটছে। বহু সমস্যা, বহু অবিচার, বহু জাতি, বহু লোকাচার সংবলিত দেশের লেখকেরা লেখার উপাদান দেশ ও মানুষ থেকে পান না, এর চেয়ে বিস্ময়কর কি হতে পারে? মানুষের প্রতি এ ধরনের উন্নাসিকতা সম্ভবত ভারতবর্ষের মতো আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ত্রতান্ত্রিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব।... ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।' আরও মনে পড়তে পারে সোইনকার সেই কথা, 'When the writer in his society can no longer function as conscience, he must recognise that his choice lies between denying himself completely or withdrawing to the positiong of a postmortem surgeon...It is about time that the African writer stopped being ar mere chronicler and understood also that part of this essential purpose is to write with a very definite vision...he must at least begin by exposing the future in a clear and truthful exposition of the present.' সোইনকার মতো মহাশ্বেতাও লেখককে দেশ-মানুষের বিবেকের ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন। আর যে সমস্ত লেখক এই ভূমিকা পালন করার পরিবর্তে দেশের মূল সঙ্কটগুলি থেকে পালাতে চাইছেন এবং পাঠককে সস্তা বিনোদন বিলিয়ে চলছেন, বিভিন্ন লেখায় মহাশ্বেতা তাঁদের আক্রমণ করেছেন। আর এই আক্রমণের কৌশল হিসাবে কখনও তিনি কিংবদন্তী ও ইতিহাসে ঢুকে গেছেন, কখনও ফিরে এসেছেন বাস্তবতায়।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৭৬), মহাশ্বেতার এই উপন্যাসটি আধুনিক কালে বাংলা উপনাসে একটি প্রধান কীর্তি। মার্কেজের 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জী'র মতোই এই উপন্যাসের নায়ক যেন নিয়তি-তাড়িত করে রুদ্ধশ্বাস গতিতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু তার এই অভিযাত্রার উৎসে থাকে কঠোর ভারতীয় বাস্তবতা। শ্রীচৈতন্যের মানবতাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ষোড়শ শতকের রাঢ় বাংলার এক আরণ্যক চুয়াড় যুবক নিজের আত্মপরিচয় গোপন করে 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করে কবিখ্যাতি লাভ করে। ভীমাদল রাজ্যের রাজা গর্গবল্লভ তাকে নিষ্কর ভূমি দেন, রাজার মন্ত্রণাদাতা মাধবাচার্য মেয়ে ফুল্লরাকে তার হাতে সঁপে দিতে চান। সমস্ত আয়োজন যখন প্রস্তুত, কবির আত্মপরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। অনিবার্য মৃত্যুদণ্ড পেয়ে কবি পালাতে থাকে, ফিরে যতে চায় নিজের শেকড়ে, চুয়াড়দের আদি পুরুষ পালকাপ্য মুনির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন অরণ্যই তাকে ধরিয়ে দেয়, এবং সব পথের শেষে কবি আবিষ্কার করে তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে স্বয়ং মৃত্যু, রাজার প্রহরী। তার নিজের জাতির কাব্য, পালকাপ্য মুনিকে নিয়ে কাব্য আর লেখা হয়ে ওঠে না, যে কাব্য থেকে যায় তা থেকে সে নিজেই সন্তর্পণে চুয়াড়দের কথা বাদ দিয়ে গেছে, এবাবেই তার নিজের ভ্রমে নিজের জাতির ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যায়। কাফকার রচনার মতোই এটি যেন নিছক উপন্যাস নয়। একটি প্যারাবল, আত্মবিস্মৃত উপনিবেশিত জাতির কাকের কোকিল হওয়ার এলিট স্বপ্নের ট্র্যাজেডি যেখানে প্রতিফলিত হয়। কবি বন্দ্যঘটী নিজের আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, নিজের দেশ, জাতি, শ্রেণি, বর্ণ, ইতিহাস ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ক্ষমতাকে আশ্রয় করে, 'অপরে'র পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন। 'আত্ম'কে অস্বীকার করে 'অপরে'র প্রতি তার এই নির্ভরতাই শেষ পর্যন্ত তার পতন ডেকে আনে।

যে নিজেকে প্রতিভাবান বলে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব অস্বীকার করে তার জীবন ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ মহাশ্বেতা দেবীর 'তারার আঁধার' (১৯৬০) উপন্যাস। বিজয় দাশ শৈশব থেকেই প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিভা বিকাশের জন্য যে শৃঙ্খলা আর বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন, তা তার ছিল না। ফলে নিজের স্বাতন্ত্র্যের অভিমানে সে কেবলই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার পরিবেশ ও চেনা জগৎ থেকে। নিজেকে প্রবল প্রতিভাবান ভাবা আর সেজন্য সব গতানুগতিক পথ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা দেখানোকে অসংগত মনে না হলেও, প্রতিভাকেও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারলে প্রতিভার ঘোষণা হয়ে দাঁড়ায় ফাঁপা আড়ম্বর। এই আড়ম্বর আরও ফুলেফেঁপে ওঠে অন্ধ স্তাবকদের স্তুতিতে। বিজয়ের 'নার্সিসাস কমপ্লেক্স' তাকে কেবলই সরিয়ে নেয় বাস্তবতা থেকে, ফলে বাস্তব জগতও তাকে প্রত্যাখান করে। সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়, তখন নিজের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাকে, যার অন্তিম পরিণতি ঘটে তার আত্মহত্যায়।

'ঘরে ফেরা' (১৯৭৯) উপন্যাসে মহাশ্বেতা সমকালীন সাহিত্যিকদের সামগ্রিক চরিত্র উদঘাটন করে দেশ ও মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি অস্বীকারের ভযাবহতার ছবি এঁকেছেন। এই অস্বীকারের ফলে নায়ক অবশেষে সম্মান ও অর্থ পায় পটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্তভাবে তার সাহিত্যিক সত্তার মৃত্যু ঘটে, বেঁচে থাকে শুধু পরজীবী শরীর। জনপ্রিয় লেখক দেবাদিদেব আত্মশুদ্ধির জন্য হিমাচল প্রদেশে এসেছে, করে চলেছে আত্মানুসন্ধান, অতীত খনন করে করে ফিরতে চাইছে ঘরে, তার উদ্দীষ্ট 'হোমকামিং'। কিন্তু নিজের সেই অতীতের সামনে

দাঁড়িয়ে সে ভয় পেয়ে যায়, সে দেখে কত মানুষ, তরুণ প্রজন্মের উঠতি প্রতিভা, রাজনৈতিক দলে প্রতিযোগী, নিজের স্ত্রী-সন্তান, সর্বোপরি নিজের বিবেক ও সাহিত্যসৃষ্টির (উপন্যাসে যাকে বারবার বলা হয়েছে এসকেপ-সাহিত্য) সঙ্গে প্রতারণা করে সে আজ সাফল্যের চূড়ায় এসে পৌঁছেছে আর বন্ধ করে দিয়ে এসেছে ফিরে যাওয়ার একের পর এক তোরণ। 'তোমার লেখা, জীবনযাত্রা, সবেতেই বোঝা যায়, হোয়াই এ সেফ গেম ইউ প্লে' —একথা বারবার শুনতে হয় তাকে। দেশ বলতে যখন বোঝায় দুর্ভিক্ষ - বেঠবেগারি - হরিজন বধ-দুর্দশা-উপবাস-বেইমানি, দেবাদিদেব সেইসময় লিখে যায় একের পর এক যৌনতা, ব্যভিচার, অস্বাভাবিক রক্ত-সম্পক, নীরক্ত বামপন্থী কর্মকাণ্ড নিয়ে শিল্পিত কাহিনী। যেসব মানুষ নিজেরাও এসকেপ খোঁজে, দেশ ও মানুষ মরে হেজে গেলেও যাদের কিছু যায় আসে না, তারাই দেবাদিদেবের পাঠক, ভরসা অন্ন, আশ্রয়। প্রলোভনে, ক্ষমতার লোভে, সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে একটু একটু করে ঘরের পথ ছেড়ে বাইরে পা দেওয়া দেবাদিদেবের ঘরে ফেরা হয় না, যদ্যি উপন্যাসের শেষে সে পেয়ে যায় সাহিত্যের গ্রেটেস্ট অনার।

এক লেখকের আত্মগ্লানির আখ্যান 'শৃঙ্খলিত' (১৯৮৫), যেখানে তিনি নিজের শৃঙ্খলিত বিবেককে আবিষ্কার করেন। সুবিধাবাদী লেখা লিখতেই তিনি অভ্যস্ত। যাঁদের ভাবমূর্তি প্রোজ্জ্বল, যাদের সবাই চেনে, যেমন রামমোহন ও মধুসূদনকে নিয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন বিনয়। আগে তিনি ছিলেন জনগণের সাহিত্যিক। এখন তিনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি মস্ত উপন্যাস লেখার কথা ভাবছেন। কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারেন, কলকাতায় কোনও আন্দোলন নেই, বরং রয়েছে চিন্তাধারায়, আচরণে, ফৌজি কানুনের মতো কড়া নিয়ন্ত্রণ আর এতেই তিনি অভ্যস্ত, নগ্ন বাস্তবতাকে স্বীকার করার সাহস তার নেই। সাধারণ মানুষ ক্রমেই তাকে খারিজ করে দিচ্ছে একথা অনুভব করে গ্লানি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না বিনয়ের।

'ব্যাধখণ্ড (১৯৯৪) উপন্যাসে যেন একটা সমাধানের কথাই ভেবেছেন মহাশ্বেতা। এই আখ্যানে 'মনাসামঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে একজন প্রতীক-পুরুষ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন লেখক। শবর জাতি হারিয়ে যাওয়ার কারন যে উচ্চবর্গের নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসন, একথা উপলব্ধি করে সে। উচ্চবর্গের একজন হিসেবে তার যে অপরাধবোধ, সেই পাপস্খালনের ভাবনা থেকে তিনি 'ব্যাধখণ্ড' লিখতে শুরু করেন। কালকেতু - ফুল্লরা এ উপন্যাসে ষোড়শ শতকের এক ব্যাধ-দম্পতি মাত্র। তাদের সঙ্গে মুকুন্দের বেশ ঘনিষ্ঠ চেনা -জানার সম্পর্ক। এভাবেই ইতিহাসের সঙ্গে মিথের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন লেখক, ব্যাধ সমাজের টোটেম, ট্যাবু সহ উঠে এসেছে তাদের জীবনযাপনের গোটা একটা ছবি। এভাবেই উচ্চবর্গের কবি হয়েও মুকুন্দরাম অনুভব করেন, আসল ইতিহাস রয়ে গেছে তলদেশে, নিম্নবর্গের জীবনের ভেতর ঢুকে সেই ইতিহাসকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়ছেন।

পরবর্তী কালে মহাশ্বেতাকে অনুসরণ করে অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র'র মতো একদল তরুণ ঔপন্যাসিক লিখতে আসেন। সত্তর দশক থেকে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। পাঠকের মনোরঞ্জন ও সস্তা বিনোদনের পরিবর্তে দেশ ও মানুষের প্রকৃত সঙ্কটগুলি উঠে আসতে থাকে তাঁদের লেখায়। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বাস্তবতাকে, মানুষের অবিচার ও শোষণের কাহিনীকে তুলে ধরতে গিয়ে মহাশ্বেতা ক্রোধে ফেটে পড়তে চেয়েছেন। খুব দ্রুত তিনি উপন্যাসগুলি লিখে গিয়েছেন, তাদের সব সময় সংযত ও শিল্পসম্মত করার কথা ভাবেননি, ভাষার ক্ষেত্রে বহু সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন, গুছিয়ে বলতে পারেননি, কিন্তু কখনই নিজের গন্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। এনগুগির সঙ্গে তাঁর তফাৎ এখানেই যে, এনগুগি লিখেছেন অল্প, ভাষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি সচেতন শিল্পী। মহাশ্বেতাকে লিখতে হয়েছে অনেক বেশি, সংযম ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে অনেক সময় তাঁর লেখা তিক্ত ও নিরক্ত হয়ে উঠেছে। পাঠককে তিনি উত্যক্ত ও অস্থির করতে চেয়েছেন, তাদের ভেতরে বিবেক ও দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু রসবোধের অভাবে সবসময় তাকে রসসিক্ত রাখতে পারেননি, বড় বেশি নগ্ন, নির্মম ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তা, বিষয়ে পুনরাবৃত্তির ফলে অনেক সময় প্রেরণার পরিবর্তে একঘেয়েমি জন্ম দিয়েছেন। আসলে তিনি যা চেয়েছেন, তা হলো অবিরাম ঘা মারতে, সুখী - স্থিতিশীল-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত পাঠকের চেতনায়, তাদের দেখাতে চেয়েছেন, কতটা জীবন ও বাস্তব বিমুখ পলায়নবাদী জীবন-যাপন তারা করে, যে জীবন ও বাস্তবতায় ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে যায় কিছু অসৎ ও সুবিধাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক। মহাশ্বেতা উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাসের সঠিক গতিপথ ও তাৎপর্যকে ধরতে পেরেছেন, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের লেখকদের দেশ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা শিখিয়ে গিয়েছেন, শুধু নিজের রচনাগুলির প্রতি তাঁর আরেকটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল, ঠিক যেমন দেখা যায় উনিশ শতকের রুশ মানবতাবাদী উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে।